

নাম: আলী হোসেন

জন্ম তারিখ: ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: দোকান কর্মচারী

শহাদাতের স্থান: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল- ঢামেক

শহীদের জীবনী

নীরব শ্রমিকের
গুলিবদ্ধ মৃত্যুই হয়ে উঠল
ফ্যাসিবাদের নির্মম প্রতীক

নাম মো: আলী হোসেন। জন্ম ১৫ অক্টোবর, ১৯৮৬ একটা ঝাঁঝালো শরৎকাল, রোদে ভেজা ধানের গন্ধে ভরপুর। সাত ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন তিনি, এক নীরব ছায়া যার হাসি ছিল আলো, কিন্তু জীবনটা ছিল পাহাড় ডিঙোনো ক্লান্তি। পিতা ইদ্রিস চৌকিদার, প্রতিদিন কারো দরজা পাহারা দিয়ে যেতেন ঘরে। মা, মোছা: রংমালা একজন নিঃশব্দ সংগ্রামী, রান্নার ধোঁয়ার আড়ালে বুক ভিজিয়ে ফেলা এক নারী। এই ঘরেই বড় হয়ে উঠেছিলেন আলী মাটির স্রাব, পয়সার হিসেব, আর খাঁটি ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে।

রাজনীতি তাঁর জীবনে কখনোই প্রবেশ করেনি। আন্দোলন তাঁর চায়ের কাপের গল্প ছিল না সেগুলো ছিল টিভির প্যাকেজ নিউজ, যেগুলো দেখা হতো শুধু “কি হইলো আবার রে ভাই” বলে। আলী হোসেন ছিলেন শ্রমিক একজন নিঃশব্দ, অনলস, অস্পষ্ট সৈনিক এই সমাজের। কামরাসীরাচরের আশরাফাবাদের এমারত মিমার বাড়ির ছোট এক কোণে, তাঁর সংসার চলতো স্ত্রী আর দুই সন্তান নিয়ে। ছেলেরা তাঁকে “আব্বু” ডেকে জড়িয়ে ধরত, আর তিনি ঘামমাখা গায়ে বলতেন, “আব্বু একটা ভালো বেতনওয়ালা চাকরি পাইলে তোদের জুতা কিনবু।” কিন্তু জীবন কখনোই তাকে এমন কিছু দেয়নি। শুধু দিয়েছিল রোদ, শ্রম, চুপচাপ বেঁচে থাকা।

তারপরে আসে সেই দিন ১৯ জুলাই ২০২৪, শুক্রবারের এক রক্তাক্ত সন্ধ্যা। ঢাকার বাতাসে টিয়ার গ্যাসের গন্ধ, রাস্তায় ছেঁড়া স্লোগান, গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে গলি। আলী হোসেন তখন কাজে যাচ্ছিলেন। কোনো মিছিলে ছিলেন না, কারো নেতৃত্বে নয়। তিনি শুধু যাচ্ছিলেন তার প্রতিদিনের মতোই, সংসারের অল্প জোগাতে ঠিক তখনই পুলিশ এসে গুলি চালায়, সামনে-পেছনে না দেখে। গুলির শব্দ থেমে গেলে, দেখা গেল মাটিতে পড়ে আছেন আলী। গায়ে গুলির ছাপ, চোখে অবিশ্বাসের জল। তিনি চলে গেছেন একটা প্রশ্ন রেখে, “আমি কেন?” রাষ্ট্র জানত, তিনি গরিব, তিনি নেতা নন, তিনি শুধু একজন সংখ্যা। তাই গুলিটি ভয় পায়নি তাকে। কিন্তু সেই গুলি শুধু একজন মানুষকে হত্যা করেনি সে ভেঙে দিয়েছে দুই সন্তানের স্বপ্ন, স্ত্রীর নিরাপত্তা, মায়ের বুক। সেই গুলি ধ্বংস করেছে একটি ঘরের রাতের নিঃশ্বাস, চায়ের কাপে ভেসে থাকা শান্তি, ছেলেদের স্কুলে যাওয়ার সাহস।

ইতিহাস জানে আলী হোসেন ছিলেন এই বিপ্লবের নীরব প্রতীক। তাঁর রক্ত এই শহরের পিচে মিশে গেছে, এই দেশের বিবেকের ওপর নেমে এসেছে এক অশ্রুসিক্ত অভিষেক। আলী হোসেন ছিলেন না আগুনের মানুষ, তিনি ছিলেন জলের মতো নরম, সহজ, জীবনদায়ী। আর ঠিক সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু আজ আমাদের সামনে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন তুলে ধরে “এই রাষ্ট্র কি কেবল বুলেটের ভয় বুঝে, না মানুষের জীবনের মূল্যও বোঝে?”

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

২০২৪ সালের ১ জুলাই সেই দিন যেন বাতাস বদলেছিল। গুরুটা ছিল মৃদু, যেন নদীর মতো ধীর প্রবাহ কিছু ছাত্র দাঁড়িয়েছিল হাতে প্ল্যাকার্ড, কণ্ঠে দাবি, চোখে জেদ। তারা বলেছিল, “কোটা সংস্কার চাই” কিন্তু আসলে তারা চাইছিল আর কিছু: ন্যায্যতা, সমতা, সম্মান। এই আন্দোলন ছিল শুধু কোটা নিয়ে নয়; এটি ছিল একটি প্রজন্মের ন্যায্য বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যেখানে শিক্ষা ছিল বিক্রি করা যায় এমন পণ্য, সেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল বলে, “আমরা ক্রেতা নই, আমরা নাগরিক।”

ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল যেন বাংলার শরীরজুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ছিল। ছাত্রেরা শ্লোগান দিচ্ছিল না শুধু, তারা নিজেদের চেতনায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। নিউমার্কেট হয়ে উঠেছিল এক অস্থায়ী স্বাধীনতা চত্বর, যেখানে বটগাছের ছায়া পড়ে না, পড়ে কেবল লাঠির ভয়, পুলিশের হুংকার, টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া। এই উত্তাল শহরের গর্ভেই ঘনিয়ে উঠছিল এক অশ্রুভেজা সন্ধ্যা, ১৯ জুলাই।

সেই রাতে, আলী হোসেন ছিলেন সেই এলাকাতেই। না, তিনি ছিলেন না কোনো মিছিলের নেতা, ব্যানারের পেছনে তাঁর মুখ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, যিনি দিনশেষে নিজের রক্ত-ঘামে উপার্জিত কড়ি হাতে বাড়ি ফিরছিলেন। হয়তো দাঁড়িয়েছিলেন একটু দেখতে, বুঝতে, বা কেবল কৌতূহলে। কিন্তু বুলেট প্রশ্ন করে না, সে শুধু বেছে নেয়, গরিবের বুককে নিশানা করে। সন্ধ্যা ছয়টার দিকে নিউমার্কেটের নাম্বারগেটের পাশে, একটি গুলি তাঁর ডান বুককে ঢুকে পড়ে নির্বাক, নির্ধ্বংস। তাঁকে ঢাকা মেডিকলে নেওয়া হয়। ততক্ষণে রক্তের নদী বইছে তাঁর শরীর থেকে। হাসপাতালের আইসিইউও তাঁর হৃদয়কে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। রাত সাড়ে দশটার দিকে, তিনি নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কেউ তখন পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখে আছে কিছু টাকা, একটা পুরনো ফোন, আর ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন।

এই মৃত্যু ছিলো অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। এটা ছিল এক দীর্ঘ পরিকল্পনার অবধারিত পরিণতি। রাষ্ট্র চেয়েছিল ভয়, ছাত্রেরা দিয়েছিল ত্যাগ। রাষ্ট্র চেয়েছিল নিয়ন্ত্রণ, ছাত্রেরা ছড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্রোহের বীজ। গুলিটা আলী হোসেনকে বিন্দু করলেও, সে বিন্দু করেছিল আমাদের বিবেক, আমাদের নীরবতা, আমাদের কাপুরুষতা।

এই মৃত্যু ছিল রাষ্ট্রের চোখে “সহজ” কারণ সে দরিদ্র, সে অপরিচিত, তার নাম নেই কোনো পার্টির তালিকায়। কিন্তু বিপ্লব ইতিহাসের রক্ত দিয়ে লেখে এবং আলীর নাম সেই পৃষ্ঠায় লেখা থাকবে।

আজ যারা বলে, “ও তো আন্দোলনের কেউ ছিল না” তারা ভুলে যায়, বিপ্লব শুধু পোস্তারে হয় না। বিপ্লব ঘটে, যখন এক খেটে খাওয়া মানুষ রক্তে ভেসে যায় রাষ্ট্রের নির্বিকার নিষ্ঠুরতায়। আলী হোসেন সেই বিপ্লবের এক নীরব সাক্ষ্য, এক অনিচ্ছাকৃত শহীদ, যার মৃত্যু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় এই রাষ্ট্রে জীবনের মূল্য নেই, যদি না তুমি ক্ষমতার প্রিয়পাত্র হও।

এই আন্দোলন ছিল ছাত্রদের মুখে স্লোগান নয়, গরিবের কণ্ঠে চাপা কান্না, নিপীড়নের দীর্ঘশ্বাস, আর সহস্র নিঃশ্ব জনতার অদৃশ্য পতাকা। আর সেই পতাকায় লেখা আছে “আলী হোসেন, আমরা ভুলিনি।”

যেভাবে শহীদ হন: এক অস্বীকৃত মৃত্যুর অনন্ত প্রহর

“কখনো কখনো রাষ্ট্র লাশকেও ভয় পায় কারণ মৃতেরা কথা বলে, জীবিতদের চেয়ে স্পষ্ট।”

সেই সন্ধ্যায়, নিউমার্কেটের নাম্বারগেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন আলী হোসেন না কোনো স্লোগানে মুখর, না কোনো ব্যানারে বাঁধা। জীবন তাকে টেনেছিল শ্রমের পথে, কিন্তু মৃত্যু এসে দাঁড়িয়েছিল অন্য গলিতে। সন্ধ্যা ছয়টা, গুলির গর্জনে কেঁপে উঠছিল শহর। আর ঠিক তখনই, এক বুলেট এসে থেমেছিল তাঁর ডান বুকে এক নিঃশব্দ পতাকা উড়েছিল হাওয়া ছাড়াই।

তাকে সঙ্গে সঙ্গে নেওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে, আইসিইউতে, এক নিঃশ্বাস আরেক নিঃশ্বাসকে ডেকে আনতে পারেনি। হৃদপিণ্ডের শব্দ থেমে গিয়েছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের বিবেক ততক্ষণেও চুপ। রাত সাড়ে দশটায় ঘোষণা আসে আলী হোসেন আর নেই। আর সেই ঘোষণায় কোনো বাঁশি বাজে না, কোনো প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি আসে না, আসে না রাষ্ট্রীয় পতাকায় মোড়ানো শেষ বিদায়ের আয়োজন। তিনদিন, হ্যাঁ, পুরো তিনদিন লাশ আটকে রাখে হাসপাতাল। একটি মৃতদেহ, যার শরীরে রাষ্ট্রের রক্তলিপি লেখা, তাকেও ফিরিয়ে দিতে হয় কাগজপত্র আর নির্লজ্জ অনুমতির পরে। যেন গুলির পরেও তাদের দখল শেষ হয়নি।

পরিবার ততদিনে ভেঙে পড়েছে। ভাইয়ের চোখে লাল রক্তজল, স্ত্রীর মুখে স্তব্ধ আহাজারি, দুই ছেলের চোখে বোঝার অসম্পূর্ণতা। তাঁর ভাই বলেছিলেন, “আমরা যা দেখেছি, তা কোনো সিনেমা না এটা রক্তমাখা বাস্তবতা। গুলির শব্দে চারদিক কাঁপছিল, আর আমরা যেন সময়ের কাছে হেরে যাচ্ছিলাম। কেউ সাহায্য করেনি, শুধু চেয়ে ছিল।”

আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয় চুপচাপ, যেন একটি জীবনের শেষরেখা নয়, বরং মুছে দেওয়া কোনো অধ্যায়। রাষ্ট্রের কোনো প্রতিনিধি ছিল না। ছিল না একটি কালো ব্যাজ, একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি নীরব শ্রদ্ধার সুর। ছিল কেবল অল্প কিছু মানুষ, অল্প কিছু চোখ, আর পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী নীরবতা। তিনি রেখে গেছেন এক স্ত্রী যিনি প্রতিদিন বালিশে মুখ লুকিয়ে বোঝেন, এখন আর কেউ রাতে দরজা খুলে বলে না, “ঘুমাও, আমি এলাম।” রেখে গেছেন দুই ছেলে যাদের জীবনের প্রথম পাঠ হয়তো এই, যে গরিবদের বাবারা রাষ্ট্রে মরলেও “শহীদ” হয় না।

তিনি মাসে পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা উপার্জন করতেন না, কোনো সুযোগ সুবিধা ছিল না, কোনো ছুটি ছিল না। তবু তিনি ছিলেন আলো। আজ সেই আলো নিভে গেছে। রয়েছে কেবল একটি ঘর অন্ধকার, নিঃশব্দ। কিছু শুকনো খাবারের প্যাকেট আর সময়, যা আর চলে না, কেবল থেমে থাকে।

আলী নামটা পোস্তারে নেই, ব্যানারে নেই, কিন্তু ইতিহাসের প্রতিটি খাঁজে তাঁর রক্ত গড়িয়ে আছে। তিনি শুধু মারা যাননি। আমাদের বিবেককেও তার সাথে কবর দিয়ে গেছেন।

প্রস্তাবনা

- ১) এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান
- ২) স্ত্রীর জন্য একটি স্বনির্ভর আয়ের ব্যবস্থা (সেলাই মেশিন দেওয়া যেতে পারে)
- ৩) দুই ছেলের শিক্ষার দায়িত্ব নেওয়া যেতে পারে

এক নজরে শহীদ পরিচিতি

নাম : মো: আলী

জন্ম : ১৫ অক্টোবর ১৯৮৬

পেশা : দোকানের কর্মচারী

পিতা : ইদ্রিস চকিদার

মাতা : মোসা: রং মালা

বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা : এমারত মিয়ার বাড়ি, আশরাফাবাদ, কামরাস্পীরচর, ঢাকা

পরিবার : স্ত্রী রত্না (গৃহিণী), দুই পুত্র রাতুল(১৫) ও সায়েম(৭) হিফজখানায় পড়ছিল।

: আর্থিক সংকুলানে রাতুলের পড়ালেখা বর্তমানে অনিশ্চিত। আলী সাত ভাই বোনের মধ্যে

: সবার ছোট ছিলেন; (রহিমা(৬৫), শামসুল্লাহ(৬২), ইয়াসিন(৬০),

: আলি আরশাদ(৫৭), আলি আকবর(৪৮) ও ময়না(৩৫)।

: পারিবারিক অবস্থা অতি নাজুক।

ঘটনার বিবরণ : ১৯ জুলাই ২০২৪ রাজধানীর নিউমার্কেট এক নাম্বারগেট এলাকায় সন্ধ্যা ৬টার দিকে

: বুকের ডান পাশে গুলিবিদ্ধ হন

মৃত্যু ও দাফন : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায়

: রাত ১০:৩০ মিনিটে মারা যান

মৃত্যুর তারিখ : ১৯ জুলাই ২০২৪, তিন দিন পর হাসপাতাল থেকে লাশ বের করা হয়,

: ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়